Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXVIII, June 2021

অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও নৈতিক বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ মোফাচ্ছেল সরকার*

[**সার-সংক্ষেপ:** সমকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে অনেক মরণাপন্ন রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এসব উন্নয়নের একটি হলো অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি। জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সচেতনতার অভাবসহ নানাবিধ কারণেই মানুষ তার বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে। যার ফলে, মানুষ ক্রমশ পতিত হচ্ছে মৃত্যুমুখে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্যই অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তির উপর যেমন নির্ভরতা বাড়ছে তেমনই এ সম্পর্কিত অজ্ঞতা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং পারিপার্শ্বিক নানান নৈতিক সংকটের জন্য এ প্রযুক্তিকেও বিভিন্ন দার্শনিক ও নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আবার জীবিত অঙ্গদাতাদের মধ্যে অঙ্গদানে বিভিন্ন কারণে অনীহা সৃষ্টির সাথে সাথে ধর্মীয় অনুভূতির কারণে মৃত অঙ্গদাতাদের থেকেও যথাযথ ভাবে অঙ্গ সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। এরকম অবস্থা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসহ উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলোতেও লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে সারা বিশ্বে অঙ্গগ্রহীতার তুলনায় অঙ্গদাতার অনেক বড় সংকট তৈরী হচ্ছে। এই সংকটের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী অবৈধভাবে উচ্চমূল্যে অঙ্গ ক্রয় বিক্রয় করছে, যা অনৈতিক ও বেআইনি। এই প্রবন্ধে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপ্রতুলতা মেটানোর জন্য অঙ্গ পাচার ও অঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত নানামূখী নৈতিক সমস্যার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে এ সম্পর্কিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও সেই প্রণীত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের সাথে নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দেশিত করণীয় দিকসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

ধারণাগত পরিভাষা: অঙ্গ প্রতিস্থাপন, অঙ্গ পাচার, প্রতিস্থাপন আইন, ট্রান্সপ্লান্ট টুরিজম ও নৈতিক সংকট।

---

* **মোঃ মোফাচ্ছেল সরকার :** এম ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ভূমিকা

অঙ্গ প্রতিস্থাপন হচ্ছে এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে অকেজো বা অসুস্থ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য একটি দেহ থেকে সুস্থ অঙ্গ বা টিস্যু অন্য কোনো দেহে বা ঐ একই দেহে প্রতিস্থাপন করা হয় (Robson et al., 2010)। চিকিৎসায় নোবেল বিজয়ী ড. যোশেফ এর হাত ধরে ১৯৫০ সালে প্রথম অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের যে দ্বার উন্মোচিত, তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সারা বিশ্বে হাজার হাজার রোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করে পুনরায় সুস্থ জীবনে ফিরে আসছে। নানাধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়। সবচেয়ে বেশি প্রতিস্থাপনকৃত অঙ্গ হচ্ছে কিডনি। তবে বর্তমান সময়ে কেবল কিডনিই নয়; হৃদপিণ্ড, ত্বক, হাত, অস্তিমজ্জা, লিভার, ফুসফুস, ককলিয়া, কর্নিয়া, লিগামেন্টসহ আরও বেশকিছু অঙ্গ সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে ("History of Organ and Tissue Transplant," 2019)। কিন্তু, এই অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, স্বভাবতই অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি অনেক জটিল। কারণ প্রথমত, এক্ষেত্রে অঙ্গগ্রহীতা ও অঙ্গদাতা উভয়ের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। আবার যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অঙ্গদাতার কাছ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা, সেটাও বিবেচনার বিষয়। এক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের জন্য নিযুক্ত সার্জন ও ডাক্তাদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এসকল নৈতিক দিকসমূহ লক্ষ্য করা হয় কিনা, কিংবা এসকল নৈতিক দিক বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা তা আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়। কেননা এই আলোচনা বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। এর সুবিধার্থে প্রথমেই আমরা জেনে নেব চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্গ প্রতিস্থাপন কীভাবে কাজ করছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্গ প্রতিস্থাপন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে জীবিত ও মৃত দু'ধরনের অঙ্গদাতার কাছ থেকেই অঙ্গ সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে জীবিত অঙ্গদাতাই উৎকৃষ্ট। জীবিত অঙ্গদাতা তার কিডনি, ফুসফুস, যকৃতের অংশবিশেষ, অন্ত্র ও শরীরের কিছু টিস্যু দান করতে পারেন। কেননা স্বাভাবিক মানুষের জন্মগতভাবেই দুইটি কিডনি থাকে, এর মধ্যে একটি কিডনি দান করলেও বাকি একটির সাহায্যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারেন। আবার ফুসফুসের একটি খণ্ড জীবিত অঙ্গদাতা দান করতে পারেন। অঙ্গদাতার জীবিত অবস্থাতেই যকৃতের কিছু অংশও দান করতে পারেন, কেননা তা কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসা যেতে পারে (Manara et al., 2012)। আবার দেহের এমনকিছু অঙ্গ রয়েছে যা জীবদ্দশায় দান করা সম্ভব নয়। যেমন, হৃদপিণ্ড, যা জীবিত অবস্থায় অঙ্গদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যে

সকল অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য রোগীর দুটি কিডনিই আবশ্যক বা পুরো একটি ফুসফুস বা সম্পূর্ণ একটি যকৃত প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রেও মৃত অঙ্গদাতার কাছ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ কারার প্রয়োজন হতে পারে। যদি জীবিত দাতার কাছ থেকে প্রতিস্থাপনের জন্য এসব অঙ্গ সংগ্রহ করা হয় তাহলে তা দাতার জীবনের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। এমনকি দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হতে পারে। ২০১৬ সালে একজন মহিলা যিনি জন্মগত ভাবেই জরায়ুবিহীন ছিলেন, তিনি ডাক্তারের সাহায্যে একজন মৃতব্যক্তির থেকে জরায়ু সংগ্রহ করে তার দেহে প্রতিস্থাপন করেন। ঐ মহিলা পরবর্তিতে সুস্থভাবে গর্ভ ধারণ করেন (Ejzenberg et al., 2018)। অবশ্য মৃত দাতার থেকে নেয়া সব অঙ্গই সবসময় সঠিকভাবে কার্যক্ষম হবে তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই রোগী ৫-১০ বছর পর পুনরায় অসুস্থ হতে পারে বা প্রতিস্থাপনকৃত অঙ্গটির কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে দেখা যায়। তাই অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে জীবিত দাতাকেই বেশি প্রধান্য দেওয়া হয় (Ejzenberg et al., 2018)।

উল্লেখ্য যে, নিশ্চিতভাবেই প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় অঙ্গের সঙ্কট মোকাবেলার জন্য অঙ্গদাতার প্রয়োজন। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দুই ধরনের অঙ্গদাতা হতে পারেন। যথা, মৃত দাতা ও জীবিত দাতা। তবে উভয় দাতার অঙ্গদান নিয়েই অনেক নৈতিক বিতর্ক রয়েছে। এমনকি রোগী ও সার্জন প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রেক্ষিতেও নৈতিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। যেমন, যদি কেউ সিদ্ধান্ত নেয় যে পরোপকারের আনন্দ বা সুখ পাওয়ার জন্য অল্প বা বেশি ঝুঁকি থাকা স্বত্ত্বেও সে একটি কিডনি দান করবে তবে এটা তার একান্তই ব্যক্তিগত পছন্দ। মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকা কোনো রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যে সুখ পায় সেটা তার নিজস্ব স্বধীনতা। কিন্তু যদি দাতা অঙ্গদানে রাজি না থাকা স্বত্ত্বেও বাহ্যিক কোনো প্রভাবে অঙ্গদানে বাধ্য হন, সেক্ষেত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয়। আবার যে ডাক্তার বা সার্জন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজটি করে থাকেন তাঁর ক্ষেত্রেও নৈতিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কারণ তিনি বা তারা শতভাগ স্বদিচ্ছা ও কর্তব্যবোধ দিয়ে উক্ত কাজটি করবেন কিনা এটা একটি অন্যতম নৈতিক বিবেচ্য বিষয়। কারণ "সার্জন ও ডাক্তারবৃন্দ রোগীদের নিছক ইচ্ছার হাতিয়ার নয়" (Spital, 2001)। তারাও নৈতিক সত্তা, তাদেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের সকল কর্মের দায় নিজেদেরকেই নিতে হয়। তাই যদিও এটা তাদের পেশা, অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার ও সার্জনদের ভূমিকা রোগী ও অঙ্গদাতার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ (Spital, 2001)।

চিকিৎসা নীতিবিদ্যা ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন

চিকিৎসা নীতিবিদ্যা হলো এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক ব্যবহার ও চর্চার ফলে তৈরী হওয়া নৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে (R.M.

Tylor, 2013)। চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় বেশ কিছু নীতি রয়েছে যেগুলো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত।

রোগীর জন্য স্বায়ত্তশাসন (autonomy) নীতিটি খুবই প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে আত্মনির্ধারণ বা স্বশাসন। রোগীর স্বায়ত্তশাসন দ্বারা রোগীর সিদ্ধান্তকে সম্মান করা বোঝায়। সাধারণত স্বায়ত্তশাসন নীতির জন্যই চিকিৎসা সেবার কোনটিকে রোগী গ্রহণ করবে অথবা কোনটিকে বর্জন করবে এ ব্যপারে প্রত্যেক রোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিজস্ব অধিকার থাকে। স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনো প্রভাব কাজ করে না। তাই এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও ফলাফল বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি নিজে সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে। ব্যক্তিকে স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার জন্য এবং স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে সিদ্ধান্ত গঠন করার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সেই সাথে ব্যক্তিকে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রন মুক্ত থাকতে হবে। কারন বাহ্যিক কোনো ভুল তথ্য দ্বারা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করলে অথবা জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলে উক্ত সিদ্ধান্তকে স্বায়ত্তশাসিত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে রোগীর নিজস্ব পছন্দ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকে রক্ষা করাই হলো রোগীর স্বায়ত্তশাসন নীতির মূল লক্ষ্য। তবে যদি রোগীর সিদ্ধান্ত গঠন ও গ্রহনের কোন যোগ্যতা না থাকে তবে এই স্বায়ত্তশাসন নীতি সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। কেবল রোগীর ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য, চিকিৎসকের ক্ষেত্রে নয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও এই স্বায়ত্তশাসন নীতি সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। এই নীতির বলেই জীবিত অঙ্গদাতা ও প্রতিস্থাপন আবশ্যক রোগী যথাক্রমে অঙ্গদান ও গ্রহন করবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিতে পারবেন (R.M. Tylor, 2013)।

কল্যাণসাধন (beneficence) চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত একটি নীতি। চিকিৎসা নীতিবিদ্যার এই নীতির মূল কথা হচ্ছে রোগীর জন্য যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করলে রোগীর সব থেকে বেশি কল্যাণ হবে সেটাই গ্রহণ করা। যদি রোগীর ভালো মন্দ বোঝার ও সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা না থাকে তাহলে ডাক্তার ও সার্জনরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার নানা দিক বিবেচনা করে রোগীর জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাটি গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিতে পারেন। কারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা বা বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা তা ডাক্তার ও সার্জনরা ভালো বুঝবেন। তবে এক্ষেত্রে ডাক্তারগণ যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ন না হন তাহলে তাঁদের দ্বারা রোগীর সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব নাও হতে পারে। এদিক থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রতিস্থাপন কখন, কোথায় এবং কি প্রক্রিয়ায় করা হলে প্রতিস্থাপন আবশ্যক রোগী ও দাতার জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণকর হবে অথবা প্রতিস্থাপন করলে আদৌ রোগীর জন্য কল্যাণকর হবে কিনা এটা ডাক্তারগণ ভালো জানবেন। এই নীতটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কেবল ডাক্তার ও সার্জনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (R.M. Tylor, 2013)।

চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত আরেকটি নীতি হলো — অ-অপরাধ প্রবণতা (non-maleficence)। অ-অপরাধ প্রবণতা বলতে চিকিৎসা নীতিবিদ্যার এমন এক নীতিকে বোঝায়, যা দ্বারা রোগীর কোনোপ্রকার অপকার বা ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। অর্থাৎ এ নীতি অনুসারে ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীর কোনো ক্ষতি করা যাবে না। এ নীতিটি কেবল রোগীর সাথেই নয়, বরং চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকলের সাথে সম্পর্কিত। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো — পরিস্থিতি অনুযায়ী ডাক্তার, সার্জন ও চিকিৎসার সঙ্গে জড়িতরা যেন রোগীর কোন ক্ষতি না হয় সেটা বিবেচনায় রেখে পদক্ষেপ নিতে পারেন। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অ-অপরাধ প্রবণতা নীতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। জীবিত দাতার অঙ্গদানে যদি জীবনের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে উক্ত নীতি অনুসরন করলে দাতার কাছ থেকে অঙ্গ নেওয়া যায় না (R.M. Tylor, 2013)।

ন্যায়পরতা (justice) চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত অন্যতম একটি নীতি। ন্যায়পরতা চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় দুইভাবে বিবেচিত হতে পারে। যথা, সমতা (equitibility) ও ন্যায় বন্টন (distributive justice)। চিকিৎসা নীতিবিদ্যায় সমতা দ্বারা সকল ব্যক্তিকে একই রকম পরিস্থিতিতে একইভাবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ভেদে চিকিৎসার মানের কোনো পরিবর্তন করা হয় না। অর্থাৎ সমতা অনুসারে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিত্তশালী বা উচ্চশ্রেণীর রোগী যে চিকিৎসা সেবা পাবে, সেই অভিন্ন পরিস্থিতিতে নিম্ন শ্রেণীর রোগীও একই রকম চিকিৎসা সেবা পাবে। ব্যক্তি ভেদে ভিন্নতা না দেখে পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বারোপ করাকে সমতা বলে। যদি এমন হয় যে দুজন রোগী জরুরি অবস্থায় রয়েছে এবং এদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসা সেবা দিলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে, সেক্ষেত্রে কোনো রোগী আর্থিক কিংবা সামাজিক অবস্থায় এগিয়ে তা বিবেচনা না করে বরং যে রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করলে তাকে সুস্থ করে তোলার সম্ভাবনা বেশি থাকবে তাকেই প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা উচিত হবে। পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপনেও সমতা প্রযোজ্য। অপরদিকে ন্যায় বন্টন বলতে বোঝায় চিকিৎসা সেবায় যে প্রয়োজনীয় সম্পদ বা উপকরণ রয়েছে সেগুলো নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ ন্যায্যভাবে রোগীদের মধ্যে বন্টন করা। ন্যায় বন্টনের মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে চিকিৎসা সেবার জন্য যার যা কিছু জরুরি তাকে তা দেয়াই ন্যায় বন্টন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও ন্যায় বন্টন অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। এই বিবেচনায় প্রতিস্থাপন প্রতিষ্ঠানের দানকৃত অঙ্গ বন্টনের ক্ষেত্রে ঐ রোগীকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত যার বেঁচে থাকার জন্য অঙ্গটি সবথেকে বেশি প্রয়োজন (R.M. Tylor, 2013)।

জীবিত ও মৃত দাতার বিবেচ্য নৈতিক নীতি

প্রতিস্থাপনের জন্য জীবিত দাতার অঙ্গদানের ক্ষেত্রে স্পিটাল উপর্যুক্ত চার প্রকার নৈতিক নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। কারণ স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যপারে দাতার জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। যেমন, দাতা নিজের ইচ্ছায় অঙ্গদান করছেন কিনা বা দাতার সুস্থভাবে বেঁচে থাকায় তার অঙ্গদান কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিনা, এসম্পর্কে দাতার পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। এমনকি এরকমও হতে পারে যে দাতা নিজ ঝুঁকি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে অবগত না থেকেই অঙ্গদান করতে পারেন। আবার অ-অপরাধ প্রবণতা নীতি অনুসারে রোগী বা দাতার কোন প্রকার ক্ষতি ডাক্তারের স্ব-ইচ্ছার দ্বারা হওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের চেষ্টা করতে হবে যাতে কারো কোনো প্রকার ক্ষতি না করে সেবা প্রদান করা যায়। এজন্য ডাক্তার, সার্জন ও ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারে কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে জীবিত দাতার অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও অন্যায় বিষয়ে আলোচনা করা ন্যায়পরতা নীতির মূল লক্ষ্য। কিন্তু, আবার মৃত দাতার ক্ষেত্রেও প্রধান নৈতিক নীতি হচ্ছে ন্যায়পরতা। মৃতদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রতিস্থাপনযোগ্য সকল অঙ্গসমূহ যেনো অপেক্ষমান রোগীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন হয় সেজন্য ন্যায়পরতার যথার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। মৃতদাতাদের কাছ থেকে পাওয়া অঙ্গ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বন্টন করবেন? সেক্ষেত্রে অপেক্ষমান কোন রোগীকে প্রাধান্য দিবেন সেটা অন্যতম নৈতিক ইস্যু, যা ন্যায়পরতার মাধ্যমে সমাধান করা যায় (Spital, 2001)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অঙ্গ প্রতিস্থাপন

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় অঙ্গদান এখনো বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মৃত অঙ্গদাতা ও মস্তিষ্ক কার্য ক্ষমতা হারানো (brain death) দাতার কাছ থেকে এখনো প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ সংগ্রহ একেবারেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি (Rahman & Shehrin, 2017)। দেশের অনুন্নত চিকিৎসা ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম এর জন্য দায়ী হতে পারে। এ সম্পর্কে আলী বলেছেন, প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গদাতার পূর্বসম্মতিক্রমে তার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে অথবা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হারানোর সময় অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে অঙ্গ সংগ্রহের জন্য যে যথাযথ ও পর্যাপ্ত ICU ব্যবস্থা দরকার তা বাংলাদেশে নেই (Ali, 2012)। তবে বাংলাদেশে সফলভাবে কিডনি, ত্বক, কর্নিয়া, ফুসফুস প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। যদিও এ প্রতিস্থাপনের হার অনেক কম। স্বল্প পরিসরে যেটুকু হচ্ছে তাতে নানা জটিলতা ও সমস্যা লক্ষ করা যায়। ২০১৭ সালের একটি গবেষণা জরিপে উল্লেখ করা হচ্ছে : “বছরে দেশে কেবল দেড়শোটির মতো কিডনি প্রতিস্থাপন হয়। বছরে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ টি কর্নিয়া সংগ্রহ

করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪ টি লিভার সংযোজন হয়েছে। ফুসফুস ও হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন একেবারেই হয়নি। অস্থিমজ্জা সংযোজন কিছুটা হচ্ছে" (পারভীন, ২০১৭)। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিস্থাপনের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, কিডনি বিশেষজ্ঞ কামরুল ইসলাম বিনা পারিশ্রমিকে ১২০০ কিডনি প্রতিস্থাপনের মাইলফলক স্পর্শ করেন। যার ফলস্বরূপ তিনি বাংলাদেশ সরকার কতৃক সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। যদিও কিডনি প্রতিস্থাপনে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৭ সাল থেকে ("অধ্যাপক কামরুলের নেতৃত্বে ১২০০ কিডনি প্রতিস্থাপন", ২০২২)। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের অঙ্গ প্রতিস্থাপনে অনেক সঙ্কট রয়েছে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এ সম্পর্কিত সকল সঙ্কট সমূহের সমাধান করা অত্যন্ত জরুরী।

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা, সঠিক শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় গোরামী, স্বদিচ্ছার অভাব, নিজের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে অনিহা, পরিচর্যার অভাব ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণসহ নানা কারণে জীবিত অঙ্গদাতার সংখ্যা বাংলাদেশে নিত্যান্তই কম। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ লিভার ফাউন্ডেশনের মহাসচিব কুসংস্কার ও ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, "অনেকে রিলিজিয়াস একটা গ্রাউন্ড দাঁড় করান যে আমি মরে গেলাম, আমার লিভার খুলে নিলো, আমার হার্ট খুলে নিলো, কি নিয়ে আমি কবরে যাবো"(পারভীন, ২০১৭)। কিন্তু বাস্তবতা হলো ধর্মে অঙ্গদান কিংবা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন, যদি ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করি তাহলে বলা যায় যে, ধর্মে এমন বলে না কেউ মরার পর অঙ্গ দান করতে পারবে না। যদি ইসলাম ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, কোরআনেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে: "...আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলো সে যেনো পুরো মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করলো" (সূরাঃ মায়েদা, আয়াতঃ ৩২)। আবার অনেক মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বৈধ। যেমন, সৌদি আরবে লিভার এবং বিভিন্ন অঙ্গের ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে (পারভীন, ২০১৭)।

১৯৮৮ সালে ইসলামি আইন পরিষদ সম্মেলনে অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে সমর্থন জানিয়েছেন। কোনো ব্যাক্তির জীবন যদি ঝুঁকিতে থাকে, তাহলে তার জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিত ও মৃতদাতা উভয়েরই অঙ্গ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে জীবিত দাতার ক্ষেত্রে যে সকল অঙ্গদান করলে তার মৃত্যু ঝুঁকি থাকবে না বা দেহের কোনো ক্ষতি হবে না সে সকল অঙ্গ জীবিত দাতা দান করতে পারবেন (Kamal, 2008)। অঙ্গদান সম্পর্কে না জেনেই অঙ্গদান করতে অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে করা হয়। তাই অঙ্গ দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত নৈতিক দিক জানা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নৈতিক বিবেচনা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্গ প্রতিস্থাপন একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের নাম, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এতেও বেশ কিছু নৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকটি দিক থেকে এসব নৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি :

প্রথমত, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রায়শই দেখা যায় — অধিকাংশ মানুষ অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে অঙ্গদান করতে রাজি হননা। আবার, অনেক ক্ষেত্রে মৃত দাতার শরীর থেকে অঙ্গ নিতে গেলেও মৃতব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে মৃত্যু পরবর্তী দেহের শারীরিক কষ্ট সম্পর্কিত ধর্মীয় ধারণাকে ভিত্তি করে অঙ্গদানকে অসম্মতি জানায়। বেশকিছু পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা গিয়েছে — "অঙ্গীকার করা দাতাদের মৃত্যুর পর মৃতের আত্মীয়রা প্রায়ই চক্ষুদান সমিতিকে কোন খবর দেন না। মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে আত্মীয়দের আবেগও অঙ্গদানে একটি বড় বাধা হয়ে দাড়াঁয়" (পারভীন, ২০১৭)। এমতাবস্থায় তা যতই প্রয়োজনীয় ও মানবিক হোক না কেন জোর খাটিয়ে অঙ্গদানে বাধ্য করাও অনৈতিক বলা চলে।

দ্বিতীয়ত, একজন সুস্থ দাতা যদি মানবিক দায়ের প্রতিশ্রুতি থেকে তার একটি অঙ্গ একজন অসুস্থ রোগীকে দান করতে সম্মত হন সেক্ষেত্রে রোগীর স্বাস্থ্যগত দিক একটি অন্যতম বিবেচনার বিষয় হয়ে দাড়াঁয়। অঙ্গ গ্রহণকারী রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু অথবা রোগীর অসুস্থ অঙ্গটি সরিয়ে উক্তস্থানে সুস্থ অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে আদৌ ঐ ব্যক্তি সুস্থ হবে কিনা সেটা বিবেচনায় রাখতে হয়। আরেকটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচনায় রাখা জরুরি তা হচ্ছে যিনি অঙ্গটি দান করছেন তা দান করার পর তিনি কতোটা সুস্থ থাকতে পারবেন? তার স্বাভাবিক জীবন এই অঙ্গদানের কারণে কী বাধাগ্রস্ত হবে? যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে একজন পুরাপুরি অসুস্থ মানুষকে আংশিক বা সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলাটা কতোটা নৈতিক হতে পারে? ধরা যাক, সম্পূর্ণ সুস্থ অঙ্গদাতা অঙ্গদানের সময় বা অঙ্গদানের পর যে শারীরিক ব্যাথা অনুভব করবেন তাকে সে ব্যাথা দেওয়াটা কতোটা নৈতিক হবে? এই নৈতিক বিতর্কগুলো বিবেচনায় রেখে যদি অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে চাওয়া হয় সেখানেও রোগী ও অঙ্গদাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন আসে। স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই উন্নত দিকটির ব্যায়ভার অনেক বেশি। সুতরাং, একজন ধনী ব্যাক্তির ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা সেবা নেয়াটা যতোটা সহজ, একজন দরিদ্র ব্যাক্তির ক্ষেত্রে ঠিক ততোটাই কঠিন (Robson et al., 2010)।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিবেচনা উল্লেখ করা যেতে পারে : প্রথম বিবেচনাটি হলো — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে গরীবদের জন্য অর্থ সাহায্য স্কীম চালু করা কতোটা সঙ্গত তা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। কারণ, কেবল অর্থ সঙ্কটের কারণে

অনেক দরিদ্র রোগী নিজের আবশ্যকীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে পারেন না। আবার কোনো রোগী যদি ধনী হয় তার জন্য প্রতিস্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা কঠিন কিছু নয়। কোনো রোগী দরিদ্র বলে কি তার সুস্থ হওয়ার অধিকার নেই? যদি গরীবদের সাহায্যের ব্যপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তবে এখানে নানাপ্রকার সঙ্কট দেখা দিতে পারে। অনেক রোগী বা তাদের আত্মীয়রা কেবল প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয় বিবেচনা হলো — ধনী ও সামর্থ্যবান অঙ্গ গ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায়ের মাধ্যমে গরীবদেরকে সাহায্য করার নীতিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এটা অনেকটা জন রলসের বন্টনমূলক ন্যায়ের (distributive justice) মতো। রলস বলেন যদি ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মূল্যের (social values) বৈষম্য কমানো না হয়, তবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। রলস তার *A Theory Of Justice* গ্রন্থে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মূল্য উন্নয়নের জন্য ধনী ও সবল শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভ্যাট আদায়ের কথা বলেন। তাঁর মতে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে ধনীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক মান উন্নয়ন করতে হবে (Rawls, 1971)।

অনেক সময় দেখা যায় — রোগী সমাজের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর একজন, সমাজে তার শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে অঙ্গদাতা মানবিক দায়বদ্ধতার প্রতি সহানুভূতিশীল না হলেও সামাজিক অবস্থার কারণে চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ চাপের আরো কয়েকটি দিক রয়েছে। সাধারণত আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায় যে, অনেক ধনী আত্মীয়গণ তাদের গরীব নিকটজনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এ সহযোগিতার কারণে পরস্পরের প্রতি একটি দায়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। দেখা গেলো যে, ধনী আত্মীয়ের দুটি কিডনীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাকে বাঁচাতে হলে কিডনী সাহায্য প্রয়োজন। এমতাবস্থায় সাহায্য পাওয়া গরীব আত্মীয় দু'ভাবে বিষয়টি ভাবতে পারে। প্রথম বিকল্প. এই ভাবনাটি হতে পারে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার অবস্থান থেকে। দ্বিতীয় বিকল্প. এটা হতে পারে যদি সে বড়লোক আত্মীয়ের স্বার্থ সংরক্ষণে এগিয়ে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে তার সহযোগিতা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে। আবার ধনাঢ্য আত্মীয়দের দিক থেকে চাপ ও দাবি উভয়ই থাকতে পারে।

প্রথম বিকল্পটি কনফুসিয়াসের সদগুণ নীতিবিদ্যার আলোকে বিবেচনা করা যায়। আমরা জানি কনফুসিয়াস পাঁচ প্রকার সদগুণের কথা বলেছেন। যার মধ্যে প্রথম সদগুণ হচ্ছে দানশীলতা (ren বা benevolnece)। এর অর্থ হলো কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বা ফলাফলের প্রত্যাশা ছাড়াই অন্যের প্রতি দয়া করা বা উপকার করা। এ সদগুণ অনুসারে মহানুভবতা দেখাতে হবে, তবে এর পরিবর্তে ফিরতি কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। এটা ইমানুয়েল কান্টের "কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য" এর সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

"কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য" নীতির মূলকথা হলো, ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন কোন প্রকার ফলাফলের আশা ব্যতীরেকেই নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে (ভূঁইয়া,২০০৩)। আর দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো চাপ প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত। চাপ প্রয়োগ ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসনকে ব্যহত করে। প্রশ্ন হলো ব্যক্তি কী কনফুসিয়ান সদগুণ দ্বারা তাড়িত হয়ে তার সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে? নাকি সে নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে অন্য কাজ করবে? এরকম পরিস্থিতিতেও আমরা নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারি।

তবে ধনী শ্রেণির কাছ থেকে আসা চাপ নৈতিকতার 'স্বায়ত্তশাসন নীতির' লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এ পরিস্থিতিতে অঙ্গদাতার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও নিজে অসুস্থ হবার ঝুঁকি নিয়ে অঙ্গ দানে বাধ্য হন। এখন যদি এমনটি হয় যে, ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও নিজে অসুস্থতার ঝুঁকি নিয়ে অঙ্গদানে বাধ্য হন তাহলে তা নৈতিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সামাজিক প্রভাব যদি নৈতিকতা নির্ধারণের মানদণ্ড হয়, তাহলে সামাজিক জীবনে ব্যক্তির ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব থাকে না। বিষয়টা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, আপনি ধনী বা প্রভাবশালী হলে আপনার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অপরদিকে একজন ব্যক্তি দরিদ্র বলে সেই বেঁচে থাকার সমান সুবিধাটা পাচ্ছে না। সবশেষে পরিস্থিতিটি বৈষম্য ও বঞ্চনাকে উজ্জীবিত করে। সামাজিক জীবনের সংহতি ও সমতার নীতি বঞ্চনার সঙ্গে বিরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ায়। শুধু এ কারণে ধনী আত্মীয়ের চাপমূলক নীতি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কৃতজ্ঞতার নীতিটি নতুন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে, তাহলো — ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকির বিনিময়ে কী অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে? তা করতে হলে ব্যক্তিকে সামারটারিয়ান হতে হবে। কিন্তু নিজের জীবনের ঝুঁকি থাকে এরকম পরিস্থিতিতে সামারটারিয়ান হয়ে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার সুযোগ কম।

অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি মস্তিষ্কের র্কাযক্ষমতা বন্ধ হওয়ার ফলে তার জীবন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। আবার তাকে যদি প্রয়েজনীয় চিকিৎসা সাহায্য বহাল রাখা যায় তাহলে তার সুস্থ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা থাকে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই ব্যক্তির বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা নেই, সেই বিবেচনায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য কোনো ব্যক্তির সুস্থতার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এরকম বাস্তবতায় আরেকটি নৈতিক উভয় সংকটের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের র্কাযক্ষমতা বন্ধ হওয়া ব্যক্তির বেঁচে থাকা অথবা সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম বা বেশি যাই হোক না কেন এমনক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের জন্য তার কাছ থেকে অঙ্গ নেয়াটাও অনৈতিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জীবনের মূল্য অনেক বেশি। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বন্ধ থাকলেও ব্যক্তিটি এখনো বেঁচে আছে। তাছাড়া বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও যদি কোনো মরনাপন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে অনুমতি

নেওয়া না হয়, তবে কোনোভাবেই প্রতিস্থাপনের জন্য তার অঙ্গ সংগ্রহ করা নৈতিক হবে না। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব হয়।

উপর্যুক্ত বাস্তবতায় পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ বিশেষ নীতি অনুসরণ করে থাকে। যেমন, সুইডেনে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল মৃত্যুর পরই অঙ্গ গ্রহণ করা যায়। রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক, এমনকি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়ে গেলেও অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অপেক্ষমান অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ তখনই সংরক্ষণ বা প্রতিস্থাপন করা যাবে যদি দাতার মৃত্যু নিশ্চিত হয় (Price, 2000)। আবার ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী অঙ্গদানে সম্মতি না দিয়ে থাকলে তার কাছ থেকে অঙ্গ নেয়া যাবে কিনা তা একটি নৈতিক বিতর্কের বিষয়। কারণ ব্যক্তির সম্মতিকে অবমূল্যয়ন করা নৈতিকভাবে অনুচিত। সুতরাং, অঙ্গ প্রতিস্থাপনকারী ডাক্তার ও প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নৈতিক দিক এবং সমস্যাগুলো বিবেচনায় রেখে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা উচিত।

অঙ্গ পাচার ও নৈতিক বিবেচনা

অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নৈতিক দিকসমূহের আলোচনায় সমস্যা হিসেবে প্রাসঙ্গিকভাবে যে বিষয়টি সামনে আসে সেটা হচ্ছে অঙ্গ সরবরাহের সংকট। প্রতিবছর বিভিন্ন সমীক্ষায় অঙ্গ প্রতিস্থাপনের যে হার দেখা যায় তাও অনেক। ২০০৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ১০৪ টি দেশ যেখানে সারা বিশ্বের প্রায় ৯০% মানুষ বসবাস, তাদের মধ্যে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৮ শত অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয় (Mahillo et al., 2013)। এতো পরিমাণ অঙ্গ প্রতিস্থাপন হওয়ার পরও অঙ্গ সংকট থেকেই যায় (Rithalia et al., 2009)। আবার অনেক দেশে অঙ্গদান নিষিদ্ধ থাকায় সেখানে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। উপর্যুক্ত দুটি বাস্তবতায় তৃতীয় আরেকটি মুনাফালোভী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এরাই মানব পাচার, কিংবা অন্য কোনো কৌশলে অঙ্গ পাচার করে থাকে। অঙ্গ পাচার যেভাবেই হোক না কেন তা সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও সুস্থ মানুষের জন্য আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই আতঙ্ক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে ক্ষতিকর।

অঙ্গদান সম্পর্কে অঙ্গদাতার ধারণা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, ধনী ও প্রভাবশালী রোগীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক অঙ্গদানকারীকে অঙ্গ প্রদান করতে বাধ্য করে থাকে। কিংবা অনেক সময় সাহায্যের নামে গরীব আত্মীয়দের ভাবাবেগকে প্রভাবিত করে থাকে। এই প্রাসঙ্গিক ধারাবাহিকতায় একটি প্রশ্ন চলে আসে, তা হলো — অঙ্গদাতা অর্থের প্রয়োজনে নিজের অসুস্থ হবার সম্ভাবনা জেনেও যদি প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট অর্থের বিনিময়ে নিজের অঙ্গটি বিক্রয় করে তখন কি

হবে? অর্থের বিনিময় প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় থেকে যায়, তা হলো অঙ্গের অর্থমূল্য কি বা কেমন বা অঙ্গদাতা কত অর্থ পাচ্ছে সেগুলো বিবেচনা করা।

আমরা লক্ষ করলে দেখব — সারা বিশ্বে বিক্রির জন্য আইনিভাবে কোনো অঙ্গের অর্থমূল্য নির্ধারণ করার প্রচলন নেই। পৃথিবীর মধ্যে ইরানই একমাত্র দেশ যেখানে কিডনি বিক্রি করার আইনি অধিকার দেয়া হয়েছে। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের রেজিস্টার করা, সংগ্রহীত কিডনি রোগীর দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না এসকল ক্ষেত্রে সেদেশের সরকার সাহায্য করে (Bengali & Mostaghim, 2017)। ইরানে প্রতিটি কিডনির মূল্যমান ৪৬০০ ডলার নির্ধারিত করে আইনি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। অর্থের বিনিময়ে কিডনি বিক্রি করার এ রেকর্ড বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইরানের ডাক্তাররা ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন বলে জানা যায় (Bengali & Mostaghim, 2017)। বর্তমানে ইরানে প্রতি বছর গড়ে ২৫০০ থেকে ২৭০০ কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় (Malekhshahi at al., 2020)। অর্থাৎ ইরানে কিডনি বিক্রি বৈধ বলে সেখানে প্রতিবছর অনেক রোগী প্রতিস্থাপন করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে। সেখানে অঙ্গ প্রত্যাশী সকল রোগীরা অন্তত কিডনির অভাবে প্রতিস্থাপন না করেই মারা যাচ্ছে না। এটা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যপার। কারণ সেখানে পর্যাপ্ত জীবিত দাতা থাকায় প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিয়ে তুলনামূলক সমস্যা কম হচ্ছে।

অঙ্গদান প্রক্রিয়ায় অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে বেআইনিভাবে কয়েকগুণ বেশি অর্থে অঙ্গ ক্রয় বিক্রয় হয় এবং বিক্রয়কারী আইনিভাবে অঙ্গ বিক্রয়ের চেয়ে কিছু বেশি অর্থ পেলেও অধিকাংশ অর্থ চলে যায় তৃতীয় বা মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে। অনেকক্ষেত্রে অঙ্গদাতা জানতেও পারেন না যে তার প্রদানকৃত অঙ্গটি প্রকৃতপক্ষে কত অর্থমূলে বিক্রয় হয়েছে। এই বেআইনি অঙ্গ বিক্রয় আরও ভয়ঙ্কর হয় যখন একটি অঙ্গ নেওয়ার কথা বলে দুই বা ততোধিক অঙ্গ না জানিয়েই নিয়ে নেওয়া হয়, বা জোরপূর্বক বেশি অঙ্গ বিক্রয় বা প্রদানে বাধ্য করা হয়। এসবের চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে অঙ্গ বিক্রয়ের কালোবাজারি। মাত্রাতিরিক্ত দামে বেআইনিভাবে অঙ্গ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে জানা যায় যে, বিশ্বে কমপক্ষে ১০% কিডনি প্রতিস্থাপন হয় কালো বাজারের মাধ্যমে (Wagner, 2014)। এই কালো বাজারে একেকটা অঙ্গ দুই লক্ষ ডলার পর্যন্ত দামে বিক্রি হয় (Lipman, 2019)।

কালোবাজার চলমান থাকার কয়েকটি অনুষঙ্গও ইতোমধ্যে বেশকিছু গবেষণায় এসেছে। অনেকসময় ব্যক্তিকে কাজের কথা বলে প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে পাচার করা হয়ে থাকে। পাচারকৃত এসব ব্যক্তিদের একটি বড় সংখ্যা হলো নারী, শিশু ও হতদরিদ্র লোকজন। অঙ্গ পাচারের সঙ্গে অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম শব্দটিও সম্পর্কিত।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনের রোগী যখন নিজ দেশ থেকে অন্য দেশ বা অন্য এলাকার দাতা সংগ্রহ করে দাতার কাছ থেকে অঙ্গ নিয়ে প্রতিস্থাপন করে তখন তাকে অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও অঙ্গ পাচারের মতো বিভিন্ন কালোবাজারি ব্যাবসা বিস্তার লাভ করে। অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম এমন একটি চর্চা যেখানে অঙ্গকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং লাভজনক উপাদান হিসেবে কেনাবেচা করা হয়। ২০০৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজমের হাত থেকে হত-দরিদ্র মানুষকে রক্ষার জন্য কি পরিমাণে অঙ্গ ও মানব পাচার হয় সে ব্যাপারে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছে ("The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism" 2008)। এরপরও প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে যদি অঙ্গ পাচারের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পায় তাহলে বোঝা যাবে যে সেসকল রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গ ও মানব পাচারের ব্যাপারে মনোযোগী না।

অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম বিসয়ক নৈতিকতা

প্রথমে দেখতে হবে এই অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম দ্বারা কোনো শ্রেণীর সুবিধা হচ্ছে? যদি এর উত্তর খুঁজতে যাই তবে দেখা যাবে যে — প্রথমত, এর দ্বারা ধনী দেশের নাগরিকদেরই সুবিধা হচ্ছে। তারা তাদের জীবন বাচাঁতে পারছে তাতে অন্য স্থান বা অন্য দেশের কোন দাতার জীবন বিপন্ন হলে অথবা দাতা কোন ঝুঁকিতে পড়লে তাদের কিছু যায় আসে না। দ্বিতীয়ত, অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজমের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী। যারা ধনী রোগীদের অঙ্গপ্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ সংগ্রহের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। দাতাকে তার সকল ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত না করেই তাকে অর্থের বা বিদেশে কাজের লোভ দেখিয়ে প্ররোচিত করে পরবর্তীতে অঙ্গদানে বাধ্য করে থাকে।

অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজম দ্বারা কাদের ক্ষতি হচ্ছে? এই টুরিজম দ্বারা কেবল দরিদ্র শ্রেণীর দাতাদের ক্ষতি হচ্ছে এবং একই সাথে সেসকল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষতি হচ্ছে যারা এই টুরিজমের কারণে তাদের যথার্থ শ্রমশক্তি হারাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে অর্থ সংকটের সমাধানের জন্য অনেক দরিদ্র দাতা নিজ ইচ্ছাতেই অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজমের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। যদিও এটা কারো কারো জন্য আর্থিকভাবে সাময়িক লাভ হচ্ছে কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় এর ফলাফল ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এসকল কারণে অঙ্গপ্রতিস্থাপন টুরিজমকে অনৈতিক বলাই সমীচীন। অঙ্গ পাচার বন্ধ করার জন্যই অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইনের প্রসঙ্গ আসে।

বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে জাতীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন: ১৯ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে অনুমোদিত হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে সংশোধন অনুযায়ী মানব অঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়

(National Organ transplant, 1984)। বিশ্বে কেবল ইরান ব্যতীত আর কোনো দেশেই অঙ্গ বিক্রয়কে অনুমোদন দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ১৯৯৯ অনুসারে, মৃত ও মস্তিষ্কের কর্ম অক্ষম দাতার থেকে কিডনি বা অঙ্গ গ্রহণ ব্যতীত কেবল নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকেই অঙ্গ নিতে পারবে (Rahman & Shehrin, 2017)। যদিও বর্তমানে এই আইন ভঙ্গের বিভিন্ন নজির প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এই অপরাধ বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশর অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন আরও কঠিন করা হবে। অর্থাৎ এরপর নিকট আত্মীয় বলতে শুধুমাত্র বাবা, মা, আপন ভাই-বোন, আপন চাচা, মামা, ফুপু, খালা ব্যতীত বা রক্তের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কেউ অঙ্গ প্রদান করতে পারবে না। তখন রক্তের সম্পর্কের সুষ্ঠু যাচাই ব্যতীত ডাক্তার বা কোনো প্রতিষ্ঠান অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না। একজন মৃত অঙ্গ দাতা অন্তত ৮ জনের জীবন বাচাঁতে পারে এবং মৃত দাতার অঙ্গ দ্বারা ৭৫ জন পর্যন্ত রোগী বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে (*Organ Donation Statistics*, 2021)। বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে যে পরিসংখ্যান রয়েছে তা উল্লেখ করা যাক।

বাংলাদেশে কঠোর আইনের জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন সম্পর্কিত অপরাধ বেশি সংগঠিত হতে দেখা যায়। কেননা বাংলাদেশে এখনও উপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় মৃত দাতার কাছ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়না। ফলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন পুরোপুরি নির্ভর করছে জীবিত আত্মীয়দের উপর, যেখানে অধিকাংশ আত্মীয়রাই অঙ্গ প্রদান করতে রাজিই হয় না। তবে বর্তমানে এই আইন থেকে বের হয়ে আসার পক্ষে সম্মতি দেখা যাচ্ছে। কারণ কঠোর আইনের ফলে সেখানে বাইরের কাউকে আত্মীয় সাজিয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করা বা অর্থের বিনিময়ে অঙ্গ ক্রয় করা অথবা জোরপূর্বক বাধ্য করা সহ নানা ধরনের অপরাধ ঘটতে পারে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপীই অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ভঙ্গের অনেক বড় বড় ঘটনা পরিলক্ষিত হয় এবং কালোবাজারে উচ্চমুল্যে অঙ্গ ক্রয় বিক্রয় চলে। উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে দুটি প্রশ্ন যুক্ত করা যায়: প্রথম প্রশ্নটি হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন নিয়ে প্রচলিত আইন ভঙ্গের কারণ কী? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো — আইন ভঙ্গের প্রতিকার কী হতে পারে? অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ভঙ্গের নানামুখী কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

প্রথমত, প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গের ব্যপক সংকট রয়েছে। সারা বিশ্বে প্রতিবছর অঙ্গের প্রতিস্থাপনে আবশ্যক রোগীর পরিমাণ অঙ্গদাতার পরিমাণের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ এক পরিসংখানে দেখা যায় — ২০২০ সালে কেবল ৩৯ হাজার টি অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে ২০২১ সালে সে দেশের ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৪০ জন রোগী অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান তালিকায় ছিলো। প্রতিদিন প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান থেকে ১৭ জন মারা যায়। প্রতি ৯ মিনিটে প্রতিস্থাপনের অঙ্গের জন্য একজন রোগী অপেক্ষমান

তালিকায় যোগ হয় (*Organ Donation Statistics*, 2021)। এতো উন্নত চিকিৎসা ব্যাবস্থা থাকার পরও যদি আমেরিকার অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গদাতার এতো সংকট হয়, সেখানে উন্নয়নশীল তথা বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অঙ্গ সংকটের পরিমান তুলনামূলকভাবে অনেক শোচনীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় জরুরিভিত্তিতে প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ না পাওয়ায় রোগীকে বাঁচানোর জন্য রোগীর আত্মীয়রা উচ্চমূল্যে অঙ্গ ক্রয় করতেও রাজি হতে পারে, কিংবা বেআইনি ভাবে অঙ্গ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারে। এই চেষ্টা অনেক সময় হতে পারে গোপনে। গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে চোরাকারবারি, পাচারকারী ও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিরা সুযোগ নিতে পারে। এসব তৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রচলিত আইন নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মৃত অঙ্গদাতার সংখ্যা অনেক কম ও মৃত অঙ্গদাতার কাছ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করা অনেক বেশি প্রতিকূল। মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। যেমন, মৃত্যুর পর প্রতিস্থাপনযোগ্য কর্নিয়ার মেয়াদ থাকে ৬ ঘন্টা, লিভারের মেয়াদ থাকে ১৫ মিনিট, কিডনির ৪৫ মিনিট, ত্বকের ২৪ ঘন্টা, অস্তির ৪৮ ঘন্টা এবং রক্ত কনিকার ৭২ ঘন্টা (Reddy & Murty, 2017)। এ সময়ের মধ্যে যদি অঙ্গ সংগ্রহ করা যায় তবেই কেবল তা প্রতিস্থাপনে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ বা অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের বাস্তবতায় তা সম্ভব নয় কয়েকটি কারণে : এক. মেডিকেল সুবিধা বাংলাদেশ বাস্তবতায় খুবই অপ্রতুল। অপ্রতুল চিকিৎসা প্রযুক্তি নিয়ে মৃতব্যক্তির অঙ্গ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। দুই. সচেতনতার অভাব ও ধর্মীয় সংস্কার রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কার থেকে মনে করা হয় মৃতব্যক্তির দেহ কদর্য করা, বিকৃত করা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা গ্রহণযোগ্য নয়। এসবের ভেতর দিয়ে অর্জিত বিশ্বাসের কারণে মৃতব্যক্তির পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন সময়ের মধ্যে স্থানীয় চিকিৎসক বা হাসপাতালে অবহিত না করার ফলে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি কী কী কারণে মৃত অঙ্গদাতার সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক কম, যার কারণে প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ হতে পারে। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রাম বা দুর্গম এলাকায় হাসপাতালের সুবিধা না থাকায় রোগী মারা যায় বাড়িতে। বাড়ি থেকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে যেতে অঙ্গগুলো আর প্রতিস্থাপন যোগ্য থাকেনা। আবার অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাসপাতালে মারা গেলেও সেখানে কৃত্তিমভাবে দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ করার সুবিধা না থাকায় অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপনের আগেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এসব কারণে অঙ্গদাতার সংখ্যা কম এবং সঠিক সময়ে অঙ্গ পাওয়া দুষ্কর বলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ভঙ্গ হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, দারিদ্রতা আইন ভঙ্গের অন্যতম কারণ। বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে (Global Proverty Update from the world Bank, 2022)। উন্নয়নশীল দেশ, বাংলাদেশ, এখানকার শতকরা ১১ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ অভাবের কারণে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের অঙ্গ বেআইনিভাবে বিক্রি করে দিতে পারে। বে-আইনিভাবে অঙ্গ পাচারের আরো একটি বড় দিক হচ্ছে মানব পাচার। কাজের লোভ দেখিয়ে বা জোর করে দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বিদেশে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে ফাঁদে ফেলে পাচার করা হয় এবং অধিকাংশদেরই নির্যাতন নিপীড়ন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে চওড়া দামে বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত অপরাধ কমিয়ে আনার উপায়

অঙ্গদান সম্পর্কে সঠিক শিক্ষার বিস্তার হলেই মানুষের মধ্যে থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত ভয় কমিয়ে আনা সম্ভব। মানুষ যখন জানতে পারে কোনো অঙ্গ কি পরিমাণে দান করলে তার শরীরিক কোনো সমস্যা হবে না এবং স্বাভাবিক জীবনে কেনো ব্যঘাত ঘটবে না, তখন অঙ্গ দান সম্পর্কিত ভীতি দূর হয়ে যাবে। সেজন্য ডাক্তার ও প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত পেশার সাথে যারা জড়িত তাদের উচিত এ ব্যাপারে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য অঙ্গ দাতাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে নেওয়া। অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত অপরাধ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর মূল কথা হলো নিজের অঙ্গসমূহের কার্যক্ষমতা হারাতে না দেওয়া। বর্তমান সময়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন এমন রোগীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব। সচেতনতার অভাবে অনেক মানুষের নানা অঙ্গ সঠিক কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে। যেমন, ধূমপানে ক্যান্সার হয়, ফুসফুসের ক্ষতি হয়। মদ্যপানে লিভার নষ্ট হয়। ধূমপান ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে শরীরের অনেক অঙ্গই স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার প্রয়েজন হয়ে পড়ে। নিজেদের স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যা এবং যত্নের মাধ্যমে যদি আমরা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাই কমিয়ে আনতে পারি তাহলে অসুস্থতার হার যেমন কমবে তেমনি অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ভঙ্গের পরিমাণও কমে আসবে। তবে মানুষ আদৌ কতটুক সচেতন হয় সেটাই ভাবনার বিষয়। কারণ, মানুষ জেনে বুঝেই দীর্ঘমেয়াদে নিজের দেহের ক্ষতি করতে পারে। যেমন– বর্তমানে প্রতিটা সিগেরেটের প্যাকেটেই অন্তত একটি ধূমপানের ক্ষতিকর দিক লেখা থাকে। এইসমস্ত তথ্য জেনেও মানুষ ধূমপান করছে। ধূমপান ও মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক সমূহ জেনে বুঝেই যারা এগুলো থেকে নিজেকে এড়িয়ে যেতে পারছেনা তারা জেনে বুঝেই

ধীরেধীরে নিজের অঙ্গপ্রতঙ্গকে ধ্বংস করছেন। এটা অনেকটা দীর্ঘমেয়াদী আত্মহত্যার সদৃশ।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন কমিয়ে আনার জন্য প্রত্যেকে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে পারে। এজন্য প্রথম করণীয় হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন আনা। এর মাধ্যমে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখা অনেকাংশে সম্ভব। খাবারে অনেক ধরনের খাদ্য রং, অতিরিক্ত তেল চর্বি এবং খাবারে গন্ধ হওয়ার জন্য পচুর পরিমাণে মসলা ব্যবহার করা হয়। দেখতে ও খেতে আকর্ষণীয় এধরনের খাবারের প্রতি মানুষের ঝোঁক দিন দিনই বাড়ছে। এসব অতিরিক্ত তেল চর্বি জাতীয় খাবার দেখতে যতোই লোভনীয় বা খেতে সুস্বাদু হোক না কেন আদতে এসব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব খাবারের চেয়ে বরং পরিমাণ মতো তাজা ফলমূল খাওয়া মৌসুমি শাক-সবজি তথাপি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলে শরীর তুলনামূলক অনেক ভালো থাকে। যেমন পরিমিত পরিমান লবন খাওয়া উচিত, কেননা অতিরিক্ত পরিমাণ লবন কিডনির ক্ষতি করে ("কিডনি ভালো রাখার ৮ উপায়", ২০২০)। আবার, চিকিৎসকরা বলেছেন, "নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহন বা সেবনে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার, কিডনি থেকে শুরু করে শরীরের যেসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। ইয়াবা সেবনে উচ্চ রক্তচাপ হয়, লিভার সিরোসিস থেকে সেটা লিভার ক্যান্সারেও পরিণত হতে পারে"(মিজানুর রহমান খান, ২০১৮)। সকল প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্যই স্নায়ুকে দুর্বল করে দেয়, ঘুম কমিয়ে দেয়, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তাই নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহন বা সেবন করা উচিত নয়।

উপসংহার

চিকিৎসা সেবায় অঙ্গ প্রতিস্থাপন একটি অন্যতম মাইলফলক। অঙ্গ প্রতিস্থাপনে যেমন অনেক সুবিধা আছে, পাশাপাশি অনেক নৈতিক সঙ্কটও রয়েছে। সব থেকে বড় সুবিধা হলো — এটা মরনাপন্ন রোগীকে সুস্থ বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা করে। তবে, এর নৈতিক সঙ্কট ব্যপক। যেমন, অঙ্গপাচার হয়, অঙ্গদাতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়, জোর করে অঙ্গ নিলে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিঘ্ন ঘটে বা মতামতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। শুধু অঙ্গদাতা ও গ্রহীতাদেরই নয়, ডাক্তারদেরও নানা কর্মের নৈতিক ইস্যু দেখা দেয়। আবার অঙ্গদান নিষিদ্ধ থাকলে প্রতিস্থাপন ছাড়াই রোগীর মৃত্যু হতে পারে। বাংলাদেশে নানাবিধ কারণে অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়। যেমন, ডাক্তার, রোগী ও অঙ্গদাতার মধ্যে দূরত্ব একটি কারণ। এছাড়াও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও আর্থ-সামাজিক কারণকেও উল্লেখ করা যেতে পারে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইনের জটিলতা আরেকটি অন্তরায়। এই আইনের যথাযথ সংশোধন করা প্রয়োজন। সকল নৈতিক দিকসমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশের অঙ্গ

প্রতিস্থাপন আইন সংস্কার করে যদি এর যথার্থ প্রয়োগ করা যায় তবে এ সম্পর্কিত নৈতিক জটিলতা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে এই প্রক্রিয়া সহজ হয় ওঠে। আবার দেশের অঙ্গ সঙ্কট রোধে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করে মৃত্যু পরবর্তী অঙ্গদানকে উৎসাহিত করে সেই অঙ্গ সংরক্ষণ ও ন্যায় বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত সকল সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন এবং সকলের নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশিকা

Ali, M. (2012). Organ transplantation in Bangladesh -challenges and opportunities. *Ibrahim Medical College Journal*, *6*, 1.

A.R. Manara, P.G. Murphy, & G. O'Callaghan. (2012). Donation after circulatory death. *British Journal of Anaesthesia*, *108*, i108–i121.

Bengali, S., & Mostaghim, R. (2017, October 15). 'Kidney for sale': Iran has a legal market for the organs, but the system doesn't always work. *Los Angeles Times*. https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iran-kidney-20171015-story.html#:~:text=In%20fact%2C%20Iran%20offers%20people,30%2C000%20kidney%20transplants%20this%20way.

Ejzenberg, D., Andraus, W., Mendes, L. R. B. C., Ducatti, L., Song, A., Tanigawa, R., Rocha-Santos, V., Haddad, L. B. de P., Francisco, R. P., D'Albuquerque, L. A. C., & Baracat, E. C. (2018). Livebirth after uterus transplantation from a deceased donor in a recipient with uterine infertility. *The Lancet*, *392*.

Global Poverty Update from the World Bank, April. (2022) https://blogs.worldbank.org/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank

History of organ and tissue transplant. (2019). *MTF Biologics*. https://www.mtfbiologics.org/resources/news-press/history-of-organ-and-tissue-transplant

Kamal, M. M. (2008). Ethical issues of organ transplantation in islam. *The Jurnal of Teachers Association, Rajshahi Medical College, Rajshahi*, *21*, 97–103.

Larijani, B., Zahedi, F., & Taheri, E. (2004). Ethical and Legal Aspects of Organ Transplantation in Iran. *Elsevier, New York*, 1241–1244.

Lipman, J. "Lulu." (2019). Should It Be Legal To Sell Your Organs? *Penn Undergraduate Law Journal*. https://www.pulj.org/the-roundtable/should-it-be-legal-to-sell-your-organs

Mahillo, B., Carmona, M., Matesanz, R., Álvarez, M., & Noel, L. (2013). Global Database on Donation and Transplantation: Goals, methods and critical issues. *Elsevier, 27*, 57–60.

Malekshahi, A., Mortezanejad, H. F., Taromsari, M. R., Delpasand, K., (2020). En Evaluation of the Current Status of Kidney Transplant in Terems of the Type of Receipt among Iranian Patients. Renal Replacement Therapy Publication, 66.

Organ Donation Statistics. (2021). HRSA (Health Resources & Services Administration). https://www.organdonor.gov/learn/organ-donation-statistics

Price, D. (2000). *Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation*. Cambridge University Press.

Rahman, M., & Shehrin, M. (2017). Status of Organ Donation and Transplantation in Bangladesh. *Transplantation, 101*. www.transplantjournal.com

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice,* Belknap Press.

Reddy, K., & Murty, O. P. (2017). *The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology* (34th ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd , New Delhi.

Rithalia, A., McDaid, C., Suekarran, S., Myers, L., & Sowden, A. (2009). Impact of presumed consent for organ donation on donation rates: A systematic review. *PMC, US National Library of Medicine National Institutes of Health*.

R.M. Taylor. (2013). Ethical principles and concepts in medicine, *Handbook of Clinical Neurology*, Elsevier, Vol. 118 (3rd series), 5-6.

Robson, N., Razack, A. H., & Dublin, N. (2010). Organ Transplants: Ethical, Social, and Religious Issues in a Multicultural Society. *Asia-Pacific Journal of Public Health, 19*, 1.

Spital, A. (2001). The Ethics of Organ Transplantation: Ethical issues in living related donors, *Emerald Group Publishing Limited*, 89-125.

The declaration of Istanbul on organ trafficking and transplant tourism. (2008). *IJN (Indian Jurnal of Nephrology), 18*, 135–140.

Wagner, L. (2014, November 11). *Organ Trafficking: More Than Just a Myth* [The University of Utah S.J Quinney College of Law, Global Justice Blog]. https://law.utah.edu/organ-trafficking-more-than-just-a-myth/

আল কোরআন, সূরা: মায়েদা : ৩২

চৌধুরী, সানজানা. (২০১৯, ডিসেম্বর ৫). “আত্মীয় না হলে রোগীকে কিডনি দেয়ার বৈধতা নিয়ে অদালতের রায়”, বিবিসি বাংলা, ঢাকা।

পারভীন. (২০১৭, সেপ্টেম্বর ১৪). “বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের অবস্থা এত করুণ কেন”, বিবিসি বাংলা, ঢাকা।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ. (২০০৩), *নীতিবিদ্যা*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, পৃঃ ১৭২।

মিজানুর রহমান খান. (২০১৮, জুন ৩). "ইয়াবা ফেনসিডিল, হেরোইন খেলে কি হয়", বিবিসি বাংলা।

"কিডনি ভালো রাখার ৮ উপায়". (২০২০, অক্টোবর ২৬). বাংলাদেশ প্রতিদিন।

"অধ্যাপক কামরুলের নেতৃত্বে ১২০০ কিডনি প্রতিস্থাপন". (২০২২, অক্টোবর ১৯), কালের কণ্ঠ।